উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম ঃ সরকারের 'ইনফেপ' থেকে অধিদপ্তর

হোসেন আলী

কিছুদিন আগে ইউনিসেফের এক জরিপ থেকে দেখা গেছে যে, ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী স্কুলগামী–স্কুল গমনোপযোগী ছেলেমেয়ের সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬৭ লাখ। এর মধ্যে ৬৯ লাখ কোনদিনই স্কুলে ভর্তি হয়নি। আর সে বছরই ভর্তি হওয়া শিশুদের মধ্য থেকে ঝরে পড়েছে ৩৯ লাখ। অর্থাৎ পরিসংখ্যান অনুযায়ী সে বছরে আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত শিশুর সংখ্যা ১ কোটি ২৮ লাখ। এদিকে সরকার ঘোষণা দিয়েছেন দুই হাজার সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা হবে, এজন্য সরকারি–বেসরকারি উদ্যোগে কিছু বর্ধিত কাজ–কর্মও চলছে। সুতরাং বয়স্ক শিক্ষার কার্যক্রমতো তৈরি করতে হবেই, এর সাথে মূল প্রশ্ন হচ্ছে এই ১ কোটি ২৮ লাখ শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনা যায় কিভাবে? এদেরকে শিক্ষার আওতায় আনা ছাড়া সার্বজনীন সাক্ষরতার লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব?

আমরা জানি তা সম্ভব নয়। এই শিক্ষাবঞ্চিত শিশুরা এসেই আমাদের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৪% নিরক্ষর জনসংখ্যার সৃষ্টি করেছে এবং করে চলছে। সুতরাং আমাদের এখনকার কর্মসূচী হতে হবে এই নিরক্ষর জনসংখ্যাকে সাক্ষর করা এবং শিশুদের মধ্যে শিক্ষাবঞ্চিতের হার শূন্য পর্যায়ে নিয়ে আসা। তাহলেই আমরা সার্বজনীন সাক্ষরতার অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারব। অন্যথায় সাক্ষরতার নামে শুধুমাত্র বয়স্ক শিক্ষার কর্মসূচী ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। উপর্যুপরি একটা সাক্ষরসমাজ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি সম্পর্কে যেখানে আমাদের শিক্ষিত এবং নিরক্ষর উভয় সমাজের ধারণার অস্পষ্টতা রয়েছে সেখানে সার্বজনীন সাক্ষরতার কর্মসূচী পদে পদে ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা তো রয়েই গেছে।

আমাদের বিপুলসংখ্যক শিক্ষাবঞ্চিত শিশুকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় আনার পথে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে পরিমিত সংখ্যক বিদ্যালয় সংস্থানের অভাব। দেশে প্রাথমিক শিক্ষালাভের জন্য সব মিলিয়ে ষাট হাজারের মত বিদ্যালয় রয়েছে। কিন্তু বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ের আওতায় আনতে হলে এই মুহূর্তে দেড় লাখ বিদ্যালয় প্রয়োজন। অথচ এরকম সংস্থান তৈরির সামর্থ্য এখন আমাদের নেই। তবে নিরক্ষরতা সমস্যার প্রধান কারণ কেবল বিদ্যালয়ের অপ্রতুলতা নয়, এর একটা বড় কারণ আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন কৌশল ও ব্যবস্থাপনার সমস্যা। বিদ্যমান অথর্ব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা যে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ও সাক্ষরতার উন্নয়নে ব্যর্থ হচ্ছে এটা বাস্তব সত্য।

এই অথর্ব রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার মধ্যে যে জিনিসটি কিঞ্চিৎ হলেও আঘাত করেছে সেটি হল বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম। এই কার্যক্রম আমাদের রাষ্ট্রায়ত্ত আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে যৎকিঞ্চিৎ হলেও প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলে দিয়েছে। আমরা যদি আমাদের বিদ্যালয় গমনোপযোগী সকল শিশুসহ জনগণের সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবায়ন চাই তবে এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা, রক্ষা করা এবং বিকশিত করা প্রয়োজন। অন্তত সে কারণে হলেও উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম একটি বাড়তি গুরুত্ব বহন করে।

বেসরকারি উদ্যোগে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম যেটা চলছে সেটা একটা সীমিত পরিসরে চলছে এবং অনেক ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবেই চলছে। এর একটা বড় অংশ চালাচ্ছে ব্র্যাক— বর্তমান শিক্ষা কেন্দ্র সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার। এছাড়া গণসাক্ষরতা অভিযান, আহসানীয়া মিশনসহ বেশ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা দক্ষতার সাথে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম চালাচ্ছে। উপানুষ্ঠানিকের আওতায় এযাবৎ প্রাক–প্রাথমিক, মৌলিক, কিশোর–কিশোরী এবং বয়স্ক এই চার অঙ্গের শিক্ষা কেন্দ্রই চলছে। কিন্তু আমাদের সার্বজনীন সাক্ষরতা অর্জনের জন্য যে 'জাতীয় উদ্যোগ' প্রয়োজন বেসরকারি উদ্যোগ এর বিকল্প নয় বরং পরিপূরক–মাত্র। সুতরাং এক্ষেত্রে জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সমন্বয়ের দায়িত্ব সরকারকে অবশ্যই নিতে হবে। তবে সমন্বয়ের নামে নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রচেষ্টা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম জোরদার করার জন্য বর্তমান সরকার ১৯৯৩ সালে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়েছেন, যার নাম 'সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম (ইনফেপ)', এবং সরকার সম্প্রতি এটিকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরে পরিণত করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান স্থানীয় ছোট ছোট এনজিও এবং কিছু জাতীয় ভিত্তিক এনজিও'র মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম শুরু করে। তাছাড়া নিজস্ব জেলা কো–অর্ডিনেটরদের মাধ্যমেও কর্মসূচীর একটা অংশ পরিচালনা করার উদ্যোগ নেয় এবং পরে এটি সংকুচিত করে আনে।

ইনফেপ ১৯৯৫ মেয়াদকালের জন্য যে প্রকল্প গ্রহণ করেছিল তাতে ৬৯টি থানায় (লালমনিরহাট ছাড়া) প্রায় ৪০ হাজারের মত শিক্ষা কেন্দ্র বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়। ইনফেপের আওতায় বাস্তবায়িতব্য এই কর্মসূচীর ব্যর্থতা এবং সফলতা উভয়ই আছে। তবে সরকারের দিক থেকে উপানুষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রবর্তন ও বিস্তার সাধনকে অবশ্যই বাস্তবানুগ এবং উন্নয়নমুখী পদক্ষেপ বলব।

বয়স্কদের সাক্ষরতা দেয়ার জন্য উদ্যোগ আমাদের দেশে এর আগে বেশ কয়েক বার নেয়া হয়েছে। কিন্তু সেগুলোর কোনটিই সফল হয়নি। সফল না হওয়ার একটা কারণ ছিল। তবে সবচেয়ে বড় কারণ কর্মসূচীর খামখেয়ালীপনাটা। কর্মসূচীটাই ছিল নাম দস্তখত শেখানো অর্থে স্বাক্ষরতা। কিন্তু নাম দস্তখত করে রিলিফের গম আনতে পারার যে সাক্ষরতা সেটা যেমন সাক্ষরতা নয় তেমনি এর ফলাফলও প্রায় শূন্য। সুতরাং বয়স্কদেরকে সাক্ষরতা দেয়ার জন্যও একটা শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার; যে ব্যবস্থাটা হতে পারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য জনসাধারণের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর জনসাধারণের অংশগ্রহণের নীতি অনুসরণের নামে কর্মসূচীকে দলীয়করণের আওতাভুক্ত করে ফেলাটা হবে ততোধিক বিপজ্জনক। উপানুষ্ঠানিকতার বদৌলতে এটা যেমন আমলাতান্ত্রিকতা মুক্ত হতে পারে তেমনি উপানুষ্ঠানিকতার সুযোগে দলীয়করণকৃত হওয়ারও আশঙ্কামুক্ত নয়। ইতিমধ্যেই সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম নানা মহল থেকে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হচ্ছে। কিছুদিন আগে দৈনিক সংবাদ–এর এক রিপোর্টে সরকারের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমের আসন্ন ২০৫ কোটি টাকার প্রকল্প বিএনপি'র দলীয় প্রকল্পে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। এবং ইনফেপেরই কোন কোন কর্মকর্তা ইনফেপের ব্যর্থতার নানারকম তথ্য দিয়েছেন বলে রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। তথ্যের সত্যতা অসত্যতার ব্যাপারটা নয়, ইনফেপের ভেতর থেকেই প্রকল্পটিকে নেতিবাচকভাবে দেখারও প্রবণতা আছে বলে মনে হয়। অথচ এ ব্যাপারে ইনফেপ কর্তৃপক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদও এ পর্যন্ত (এই প্রবন্ধ লেখকের) চোখে পড়েনি। আসলে ইনফেপ কর্তৃপক্ষ 'আমি কার খালু' অবস্থানে আছেন বলেই মনে হয়। ইনফেপের ৯০ শতাংশ শিক্ষাকেন্দ্র বাস্তবায়নের দায়িত্ব বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের।" আর এসব বেসরকারি সংস্থা সম্পর্কে আস্থার সংকট ইনফেপের মধ্যে রয়েছে বলেই মনে হয়।

ইনফেপ যদি এনজিও নির্বাচনে ভুল করে থাকে সেটা ভিন্ন কথা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার মত এনজিও দেশে আছে। অবশ্য এমন এনজিও অনেক রয়েছে যারা এ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত নয় বা আদৌ নির্ভরযোগ্য নয়।

কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছে এনজিওদের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম বাস্তবায়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত সঠিক বলে ইনফেপ কর্তৃপক্ষ মনে করেন কিনা। আর মনে করলে অবশ্যই আস্থার সংকট থেকে বের হয়ে এসে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা দাঁড় করাতে হবে। সরকার যদি মনে করেন যে সরকারি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রম চালানো সম্ভব তবে সেটা ভুল হবে। তাহলে সরকারের উচিত হবে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থাকেই এ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা অথবা দাতা সংস্থাসমূহকে নিজ নিজ দায়িত্বে সরাসরি এনজিওদের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালনার পরামর্শ দেয়। অন্যথায় ইনফেপ বা উপানুষ্ঠানিক অধিদপ্তরকে অবশ্যই দায়িত্ব নিয়ে এনজিও বাছাই করতে হবে এবং বাছাইকৃত এনজিওগুলো সম্পর্কে আস্থাশীলতা ও জবাবদিহিতার নীতি অনুসরণ করে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে হবে। এনজিওদের মাধ্যমে বাস্তবায়িতব্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীর সফলতা এবং ব্যর্থতার দায়দায়িত্ব ইনফেপের নয় এমন ধারণা থাকলে যেমন এই কর্মসূচী ব্যাহত হবে তেমনি সংশ্লিষ্ট এনজিওদের দায়িত্বহীনতা এবং ব্যর্থতার আশঙ্কা দ্বারা পরিচালিত হলেও কর্মসূচী সফল হবে না। এনজিও এবং সরকারের যৌথ পরিচালনায় বাস্তবায়িতব্য এই

তারিখ ০৭-OCT-1995